بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ০৫ ফাতাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় হযরত কা'ব বিন মালিক এবং অন্য কতক সাহাবীর তাবুক যুদ্ধ থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া এবং এতে মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও উল্লেখ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে জামা'তকে উপদেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন,

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনজন মু'মিনও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। তাদের মধ্য থেকে একজনের দীর্ঘ বর্ণনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি অর্থাৎ সেই সাহাবী বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর ফিরে আসার পর যখন আমি তাঁর কাছে পৌঁছি তখন আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করি, বলো তো, পেছনে রয়ে যাওয়া আর কেউ এসেছে কি না? আর তারা ক্ষমা চাওয়ার কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এবং তাদের সাথে কী আচরণ করা হয়েছে? তারা জানায়, লোকেরা এসেই অজুহাত উপস্থাপন ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং বলছে যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। তিনি (সা.) তাদের জন্য দোয়া করে দিচ্ছেন। তিনি অর্থাৎ এই সাহাবী হযরত কা'ব বলেন, আমার মনে হলো, আমিও কোনো অজুহাত উপস্থাপন করে ভর্ৎসনা থেকে বেঁচে যাব। কিন্তু পরক্ষণেই আমার কিছু মনে হলো এবং আমি সাহাবীদের জিজ্ঞেস করি, কারা কারা এসেছে? তারা যাদের নাম বলে তারা সবাই ছিল মুনাফিক। তারা মাত্র দুইজন মু'মিনের নাম বলে এবং জানায়, তারা কোনো অজুহাত উপস্থাপন করেন নি, বরং নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি কেন মুনাফিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবো? যেগুলোকে প্রকৃতপক্ষে অপারগতা বলা চলে না– এমন অপারগতা উপস্থাপন করার চেয়ে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়াই শ্রেয় যে, ভুল হয়ে গেছে; আপনি আমার বিষয়ে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত প্রদান করুন। সুতরাং এই চিন্তা আসার পর আমি অপরাধ স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিই এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। বস্তুত আমি যাই এবং মহানবী (সা.)-কে স্পষ্টভাবে বলে দেই যে, আমার অলসতা ও উদাসীনতার কারণেই আমি যুদ্ধে অংশ নিই নি, নতুবা কোনো প্রকৃত অপারগতা ছিল না। এর প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) বলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তোমার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ আসছে, তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হবে। এই সাহাবীর নাম ছিল কা'ব বিন মালিক। তিনি বর্ণনা করেন, এই নির্দেশে আমি চরম কষ্ট পাই। কারণ মদীনায় সবাই মুসলমানই ছিল, আর যারা মুনাফিক ছিল তাদের মধ্য থেকেও কারো এদের সাথে কথা বলার সাহস ছিল না। [এই পুরো ঘটনা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম, বিস্তারিত গত খুতবায় বর্ণনা করেছি।] তিনি (রা.) খুতবায় এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে, যেমনটি আমি বলেছি, জামা'তকে উপদেশও দিয়েছিলেন। তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখানে অর্থাৎ কাদিয়ানে তো আমি দেখেছি, [এটি ১৯৩৬ সালের কথা;] যাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষেধ, অর্থাৎ যারা শাস্তিপ্রাপ্ত, তারা পাড়া-মহল্লায় আহমদীদের বাড়িতেও চলে যায়। মহল্লাবাসীরা হয়ত ঘুমিয়ে

থাকে আর তারা টেরই পায় না। এখানকার কোনো কোনো আহমদী সাপ পুষছে! কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, এই সাপগুলো আল্লাহ্‌কেও দংশন করতে পারবে, কিংবা তাঁর রসূলকে বা খলীফাকেও দংশন করতে পারবে না। এরা তাদেরকেই দংশন করবে যারা এদের পোষে। আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিরাপদ। কারণ আল্লাহ্ তা'লা যাকে নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে নেন, তাকে কে দংশন করতে পারে? এরা তাদেরকেই দংশন করবে যাদের তারা দংশন করতে সক্ষম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই সাপগুলোর কর্মকাণ্ডকে দেখার পরও তারা উপেক্ষা করে।

সেই সময়ে কিছু নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল যার কারণে তাঁকে (রা.) একথা বলতে হয়েছিল। এরপর তিনি আরো বলেন, মোটকথা মদীনায় কোনো মুনাফিকও তাদের সাথে কথা বলতে পারত না। হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, এই নির্দেশের কয়েকদিন পর জানা যায়, মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, স্ত্রী-সন্তানরাও যেন এই লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন সাহাবী বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার স্বামী তো আগেই মৃতপ্রায় হয়ে আছেন; খাওয়াদাওয়াও করেন না, ঘুমানও না। তাছাড়া অতি বৃদ্ধ হবার কারণে সব সময় সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যোগ্য তো তিনি পূর্বেই ছিলেন না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারি। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এতটুকু অনুমতি আছে। হযরত কা'ব বলেন, এতে আমার মনে হলো, আমিও কেন নিজের জন্য এমন অনুমতির ব্যবস্থা করি না? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, তিনি বৃদ্ধ, আর আমি যুবক; আমার জন্য এমনটা করা সমীচীন নয়। তাই আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও। এমন যেন না হয় যে, আমি তোমাকে ডাকলে তুমি উত্তর দিয়ে বসবে। অন্য কারও সম্পর্কে তো আমার এই ধারণা ছিলই না যে, সে আমার সাথে কথা বলবে। হ্যাঁ, মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও মমতার কারণে এই ধারণা ছিল যে, আমার কষ্ট দেখে তাঁর নিশ্চয়ই দয়া হবে। তাই আমি তাঁর মজলিসে যেতাম এবং উঁচু গলায় 'আসসালামু আলাইকুম' বলতাম। এরপর দেখতাম– তাঁর (সা.) ঠোঁট নড়ে কি না; কিন্তু তিনি উত্তর দিতেন না। আমি অস্থির হয়ে উঠে আসতাম এবং ভাবতাম, হয়ত তাঁর ঠোঁট নড়েছিল, কিন্তু আমি দেখতে পাই নি। তাই তখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতাম এবং পুনরায় ফিরে এসে উঁচু গলায় 'আসসালামু আলাইকুম' বলে আবারও তাঁর ঠোঁটের দিকে তাকাতাম। আবার উঠে আসতাম, আবার যেতাম, কিন্তু তিনি (সা.) উত্তর দিতেন না। তবে আড়চোখে কখনো কখনো আমার দিকে তাকাতেন।

তিনি বলেন, যখন অনেক দিন কেটে যায়, তখন আমি আমার এক চাচাতো ভাইয়ের কাছে যাই, যার সাথে আমি সবসময় খাওয়াদাওয়া ও ওঠাবসা করতাম। সে তার বাগানে কাজ করছিল। আমি তাকে বললাম, হে আমার ভাই! তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা দুইজন সবসময় একসাথে থেকেছি এবং আমাদের কোনো কথা একে অপরের কাছে গোপন নেই। তুমি ভালো করেই জানো, আমি একজন একনিষ্ঠ মুসলমান এবং কপটতার কোনো লেশ আমার মধ্যে নেই। আজ আমি অস্থির হয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি; বলো তো, আমি কি মুনাফিক? কিন্তু সে কোনো উত্তর দেয় নি আর শুধু আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকায়, যার অর্থ ছিল– আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন।

তিনি বলেন, যখন এমন ভাই– যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, সে আমাকে এই উত্তর দেয়– তখন আমার মনে হলো, পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আর আমি অস্থির

হয়ে বাগানের দেয়াল টপকে বাইরে চলে আসি এবং পাগলের মতো শহরের দিকে যেতে থাকি। যখন শহরের কাছে পৌঁছি, তখন এক ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, তুমি কি অমুক ব্যক্তি? আমি বলি, হ্যাঁ। তখন সে আমাকে একটি চিঠি দেয় এবং বলে, এটি অমুক বাদশা পাঠিয়েছে। সে ছিল আরবের এক খ্রিষ্টান বাদশা, যে রোম সরকারের অধীনস্থ ছিল। আমি চিঠিটি খুলে পাঠ করি। তাতে লেখা ছিলঃ আমরা জানি, তুমি আরবের একজন নেতা; অথচ মুহাম্মদ (সা.) তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন, যদিও তোমার কদর করা উচিত ছিল। তুমি যদি আমার কাছে চলে আসো, তবে আমি তোমার মর্যাদানুযায়ী তোমার সাথে ব্যবহার করব।

(কা'ব বিন) মালিক বলেন, আমার ভাই আমাকে যে জবাব দিয়েছিল, অর্থাৎ যখন চাচাতো ভাইয়ের বাগানে গিয়েছিলাম তাতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। [অর্থাৎ সেই সময়েও প্রচণ্ড অস্থিরতা ছিল।] এই চিঠি দেখে আমার বজ্রাহতের মতো অবস্থা হলো। আমি ভাবলাম, এটি শয়তানের শেষ আক্রমণ। এই পরিস্থিতিতে আমার যেন পদস্খলন না ঘটে। আমি সেই দূতকে বলি, আমার সাথে এসো। এক স্থানে একজন উনুন জ্বালাচ্ছিল। আমি চিঠিটি টুকরো টুকরো করে সেই আগুনে ফেলে দেই এবং তাকে বলি, তোমার বাদশাকে বলে দিও, এটিই তার (চিঠির) উত্তর। এটি ছিল তার পরীক্ষা ও বিপদের চূড়ান্ত মুহূর্ত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা করুণা করেন এবং মহানবী (সা.)-কে বলেন, তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হোক।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক জায়গায় বলেন, কা'ব বিন মালিক (রা.)-র ঘটনাটি কত-না শিক্ষণীয়! তিনি সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন এবং মক্কা বিজয়েও তাঁর সাথে ছিলেন, কিন্তু অলসতার কারণে তাবুকের যুদ্ধে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে এমন কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তার সালামের উত্তর পর্যন্ত দিতেন না; সকল মুসলমানকে (তার সাথে) কথা বলতে বারণ করে দেন, এমনকি তার স্ত্রীকেও (তার কাছ থেকে) আলাদা করে দেন। এমন পরিস্থিতিতে গাস্সানের বাদশার দূত তার কাছে চিঠি নিয়ে আসে, যার মাঝে লেখা ছিল, তোমার নেতা তোমার মূল্যায়ন করেন নি, তাই তুমি আমার কাছে চলে আসো। তিনি বলেন, এটি শয়তানের চূড়ান্ত আক্রমণ! একথা বলে তিনি চিঠিটি তন্দুর বা উনুনে নিক্ষেপ করেন এবং দূতকে বলেন, এই বার্তাটি তোমার বাদশাকে পৌঁছে দিও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তের সেই যুগের অবস্থার প্রেক্ষিতে বলেন, কিন্তু বর্তমান সময়ের মানুষ এমন– যদি কাউকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বা কৈফিয়ত তলব করা হয়, উত্তরে তারা বলে, আমাদের সেবার কথা বিবেচনা করা হয় নি, আমাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি। স্মরণ রাখা উচিত, ব্যবস্থাপনা এক বিষয় আর সেবা করা ভিন্ন বিষয়। ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যদি কেউ ভুল করে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তা সে যে-ই হোক না কেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র নির্দেশের আলোকে ধর্মের জন্য এমনভাবে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করো যেন শয়তানকে বিতাড়িত করতে পারো। কিন্তু কখনোই প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষায় কাজ কোরো না, আর সেবা করে এটি ভেবো না যে, আমাদের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আর আল্লাহ্‌র সমীপে (নিজেদের সেবার) বড়াই কোরো না, অনুগ্রহ করেছ বলে খোঁটা দিও না। সর্বতোভাবে ইসলামের সেবা করো। [অনুগ্রহের খোঁটা দিও না বরং সেবা করে যাও; আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য এই চেতনাই থাকা উচিত।] এটি ছিল খিলাফতের শুরুর দিকের খুতবাগুলোর একটি উদ্ধৃতি; প্রথম উদ্ধৃতিটি ছিল ১৯৩৬ সালের।

তাবুকের যুদ্ধাভিযান এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বরকতময় সফর সাব্যস্ত হয় যে, গোটা আরব ভূখণ্ডে মুসলমানদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র আরব জুড়ে ইসলামের পতাকা উড়তে আরম্ভ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কেও বলেছেন। তিনি বলেন, তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে তায়েফবাসীরাও এসে বশ্যতা স্বীকার করে। [পূর্বে তারা যুদ্ধ করছিল, এরপর তারা আনুগত্য বরণ করে।] এরপর আরবের অন্যান্য গোত্রও পালাক্রমে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র আরব জুড়ে ইসলামী পতাকা উড়তে আরম্ভ করে।

ফিরে আসার পর একটি সেনাভিযানও হয়েছিল, যাকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের অভিযান বলা হয়, যা নাজরানে বনু হারিস বিন কা'ব গোত্রের শাখা বনু আব্দুল মাদান অভিমুখে ছিল। যার নামে এই গোত্রের নামকরণ করা হয়েছিল, সেই আব্দুল মাদান ছিল বনু হারিস গোত্রের পূর্বপুরুষ এবং তার নাম ছিল আমর বিন ইয়াযীদ। ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত অনুসারে, এই অভিযানটি দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। যদিও ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, এই অভিযানটি দশম হিজরীর রবিউল আখের বা জমাদিউল আউয়ালে সংঘটিত হয়েছিল। সীরাত খাতামান নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নাজরান অভিমুখে খালিদ বিন ওয়ালীদের অভিযানের তারিখ দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল বলে উল্লেখ করেছেন।

যাহোক, এর বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে নির্দেশ দেন, যুদ্ধের পূর্বে তিনবার এদেরকে, অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্যে এই সেনাভিযান প্রেরিত হয়েছিল– তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা যদি (ইসলাম) গ্রহণ করে তাহলে উত্তম, অন্যথায় যুদ্ধ করবে। অর্থাৎ তারা যদি যুদ্ধ করার চেষ্টা করে তবুও তুমি তাদেরকে তিনবার ইসলামের শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানাবে। এরপরও যদি যুদ্ধ করতে চায় তাহলে ঠিক আছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। হযরত খালিদ (রা.) তদ্রূপই করেন এবং এরা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর হযরত খালিদ (রা.) তাদের মাঝে অবস্থান করেন; [অর্থাৎ কোনো যুদ্ধ হয় নি; তিনি কেবল তাদের তবলীগ করেন এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়।] হযরত খালিদ (রা.) তাদের মাঝে অবস্থান করেন এবং তাদেরকে ইসলাম, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের শিক্ষা দিতে শুরু করেন, আর মহানবী (সা.)-ও হযরত খালিদ (রা.)-কে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর হযরত খালিদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং লেখেন: **আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে খালিদ বিন ওয়ালীদের পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সেই আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করি যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। পর সমাচার, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতি আশিস বর্ষণ করুন! আপনি আমাকে বনু হারিস অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি যেন তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাই। এরপর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে আমি যেন তাদের মাঝে থেকে তাদেরকে ইসলামের বিধান, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নত শিক্ষা দেই। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে আমি যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করি।** [কিছু বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় না, কিংবা অন্য স্থানে কিছু কথার সাথে মিলে যায়। কিন্তু বলপ্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণ করানো আদৌ ইসলামের শিক্ষা নয়। (একথা বলার) উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, যদি তারা কোনো চুক্তি না করে অথবা এরপরও যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে তোমাদের তাদের সাথে যুদ্ধ

করার অনুমতি আছে।] তিনি (রা.) বলেন, **আমি তাদের কাছে আসি এবং আপনার নির্দেশ অনুসারে তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেই এবং অশ্বারোহীদেরকে তাদের কাছে (এ বার্তাসহ) প্রেরণ করি যে, 'হে বনু হারিস! ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদ থাকবে।' ফলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে।** [তিনি তবলীগ করেন, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এই বাক্য থেকে এটিও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন, কেননা তারা যুদ্ধের জন্য প্রথমে আক্রমণ করে নি। প্রতিপক্ষ যেহেতু আক্রমণ করে নি, তাই এরাও (তথা মুসলমানরাও) যুদ্ধ করতে যান নি; তবলীগ করতে গিয়েছিলেন, তা-ই করেন।] এরপর তিনি (রা.) লেখেনঃ **এখন আমি তাদের মাঝে অবস্থান করছি এবং ধর্মের আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান সম্পর্কে তাদের অবহিত করছি। আগামীতে আপনার পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসবে, আমি সে অনুযায়ী কাজ করব। ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।**

মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-র এই পত্রের উত্তরে বলেনঃ **বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে খালিদ বিন ওয়ালীদের প্রতি সালাম। আমি সেই আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করি যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। পর সমাচার, দূত মারফত তোমার পত্র আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং জানতে পারলাম, বনু হারিস ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যুদ্ধের পূর্বেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর এটি আল্লাহ্‌র হিদায়াত যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন। অতএব, তুমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র পুরস্কারের সুসংবাদ দাও এবং ঐশী শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করো। আর তাদের কয়েকজনকে তোমার সাথে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও। ওয়াসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।**

হযরত খালিদ (রা.) এই নির্দেশনা পেয়ে বনু হারিসের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। যাদেরকে তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাদের নাম হলো, কায়েস বিন হুসাইন, ইয়াযীদ বিন আব্দুল মাদান, ইয়াযীদ বিন মুয়াজ্জাল, আব্দুল্লাহ্ বিন কুরাদ, শাদাদ বিন আব্দুল্লাহ্, আমর বিন আব্দুল্লাহ্। এই লোকেরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তাদের দেখে বলেন, এরা কারা? দেখে মনে হচ্ছে, এরা হিন্দি (তথা ভারতীয়) লোক। নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এরা বনু হারিস গোত্রের সদস্য। এই লোকেরা মহানবী (সা.)-কে সালাম দেয় এবং বলে, **আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই।** মহানবী (সা.) বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নাই এবং নিঃসন্দেহে আমি তাঁর রসূল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরাই কি সেসব লোক যারা নিজেদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ হলেই তাদের (পরাজিত করে) তাড়িয়ে দাও? লোকেরা নীরব থাকে, তাদের মাঝে কেউ অগ্রসর হয় নি, অর্থাৎ কথা বলে নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কথাটির পুনরাবৃত্তি করেন, তবুও লোকেরা নীরব থাকে। তাদের মাঝে কেউ অগ্রসর হয় নি, কেউ উত্তর দেয় নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তৃতীয়বার কথাটির পুনরাবৃত্তি করেন। তাদের মাঝে কেউ অগ্রসর হয় নি, এমনকি মহানবী (সা.) চতুর্থবার পুনরাবৃত্তি করেন যে, যখনই শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করো তখন তাদেরকে তাড়িয়ে দাও। অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে অনেক শক্তিশালী মনে করতে। তখন ইয়াযীদ বিন আব্দুল মাদান নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জি, আমরাই সেসব লোক, যারা কারো সাথে যুদ্ধ হলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতাম। [আর তিনিও চারবার এ কথা নিবেদন করেন।] আমরা যুদ্ধবাজ এবং সাহসী ছিলাম; কিন্তু এখানে (স্বাভাবিকের) বিপরীত ঘটনা

ঘটেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ– এ কথা যদি খালিদ আমাকে না লিখত, তাহলে আমি তোমাদের মাথাগুলো তোমাদের পদতলে নিক্ষেপ করতাম। ইয়াযীদ বিন আব্দুল মাদান নিবেদন করেন, আমরা আপনার অথবা খালিদের প্রতি কৃতজ্ঞ নই। [নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।] তিনি বলেন, আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ নই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তবে তোমরা কার প্রতি কৃতজ্ঞ? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছেন। [তিনিও সুন্দর উত্তর দিয়েছেন।] রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলছ। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এটা বলো যে, তোমরা কোন কারণে অজ্ঞতার যুগে নিজেদের বিরোধীদের ওপর জয়যুক্ত হতে? তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা সম্মিলিতভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম। [তারা মনে করত, আমরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করব, তাহলে আমরা অবশ্যই জয়যুক্ত হব; আমাদের ওপর কেউ জয়যুক্ত হতে পারবে না।] যখন ইসলাম আসল এবং ইসলাম সকল গোত্রকে একতাবদ্ধ করল এবং বিভিন্ন গোত্র একটি প্রাণের ন্যায় হয়ে গেল, তখন তারা বুঝতে পারল, এরাও একতাবদ্ধ আর এদের সাথে যুদ্ধ না করাই মঙ্গল। বরং শুধু যুদ্ধ করব না– তা নয়, বরং ইসলামও গ্রহণ করে নিই, কেননা এটাই সত্য ধর্ম। হুযূর (সা.) কায়েস বিন হুসাইনকে বনু হারিসের আমীর নিযুক্ত করেন আর শাওয়াল মাসের শেষে অথবা যুল কা'দার শুরুতে তাদের বিদায় দেন। লোকেরা নিজ জাতিতে পৌঁছানোর চার মাস পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তিরোধন হয়।

মহানবী (সা.)-এর শেষ যুদ্ধাভিযান ছিল তাবুকের যুদ্ধাভিযান। আর শেষ সেনা অভিযান বা সারিয়্যা যা তিনি (সা.) প্রেরণ করেছিলেন তা ছিল উসামার সেনাদল। উসামার সেনাদলের বিস্তারিত আলোচনা সেটির বিবরণে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র বিবরণে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও প্রাসঙ্গিকতার কারণে সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করে দিচ্ছি। বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) লোকদেরকে হযরত যায়েদ, হযরত জাফর এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার (রা.) মৃত্যুসংবাদ দেন, আর তা লোকদের কাছে তাদের সংবাদ পৌঁছানোর পূর্বেই দেন। তিনি (সা.) বলেন, যায়েদ (রা.) পতাকা নিলেন। [এর পূর্বে অর্থাৎ উসামার সেনাদলের পূর্বেও একটি সেনাদল গিয়েছিল।] তিনি পতাকা নিলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর জাফর (রা.) পতাকা নিলেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর ইবনে রওয়াহা (রা.) পতাকা নিলেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। [তাঁর (সা.) চোখ থেকে তখন অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি বলেন,] শেষে আল্লাহ্র তরবারির মধ্য থেকে একটি তরবারি খালিদ বিন ওয়ালীদ পতাকা নিলেন, এমনকি আল্লাহ্ তাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করলেন।

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন মহানবী (সা.) মদীনা মুনাওয়ারায় ফেরত আসেন, সে সময় দক্ষিণ দিক থেকে মদীনাবাসীদের কোনো শত্রুর ভয় অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু উত্তর দিকে রোমানদের পক্ষ থেকে তখনও পর্যন্ত আশঙ্কা রয়ে গিয়েছিল। কেননা সেখানকার খ্রিষ্টানরা নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়ে খুব গর্ব করত, তাই যে-কোনো মুহূর্তে তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এমনিতেও মুতার যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ নেওয়া তখনও বাকি ছিল, যদিও হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র দক্ষতার কারণে সেই যুদ্ধ থেকে মুসলিম সেনাদল মদীনায় ফেরত আসতে সক্ষম হয়েছিল। বিদায় হজ্জ পালন শেষে মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার পর বেশি দিন হয় নি, এর কিছুদিন পরই হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র নেতৃত্বে একটি সেনাদলকে সিরিয়া আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত উসামা (রা.)-র সেনাদলের প্রস্তুতি মহানবী (সা.)-র মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে শনিবার সম্পন্ন হয় আর তাঁর অসুস্থতার পূর্বেই এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। তিনি (সা.) সফর মাসের শেষে রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতির আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমার পিতার শাহাদাতের স্থান অভিমুখে যাত্রা করো; [অর্থাৎ প্রথম যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা.)-কে যেখানে শহীদ করা হয়েছিল, তিনি (সা.) সেখানে যেতে বলেন;] আর গিয়ে ঘোড়া দিয়ে তাদের অর্থাৎ শত্রুদের পিষে ফেলো। আমি তোমাকে এই সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করছি। অপর একটি রেওয়ায়েতের বর্ণনামতে মহানবী (সা.) বলেন, বালকা এবং দারুমকে ঘোড়া দিয়ে পিষ্ট করো। [বালকা সিরিয়ায় অবস্থিত একটি এলাকা যা দামেস্ক ও ওয়াদিউল কুরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। দারুম হলো মিশর যাবার পথে ফিলিস্তিনের গাজার পর একটি জায়গা।] আর সিরিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিয়ে তিনি (সা.) বলেন, সকাল হবার সাথে সাথে উবনাবাসীদের ওপর আক্রমণ করো। [উবনা সিরিয়ায় বালকা অভিমুখে একটি জায়গার নাম।] আর তিনি (সা.) বলেন, দ্রুততার সাথে সফর করো যেন তাদের (তথা শত্রুদের) কাছে সংবাদ পৌঁছার পূর্বেই পৌঁছাতে পারো। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সফলতা দান করলে সেখানে অবস্থান সংক্ষিপ্ত রাখবে। আর পথপ্রদর্শকদের সাথে নিয়ে নেবে এবং পথপ্রদর্শক ও গোয়েন্দাদের অগ্রে প্রেরণ করবে। মহানবী (সা.) হযরত উসামা (রা.)-র জন্য স্বহস্তে একটি পতাকা প্রস্তুত করেন, অতঃপর বলেন, আল্লাহ্র নামে তাঁর পথে জিহাদ করো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে। আর ধোঁকা দেবে না, শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করবে না এবং শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করবে না। [এই বাক্যাংশটি শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রতি ইঙ্গিত করছে; শত্রু যদি আক্রমণ করে তবেই তোমরা যুদ্ধ করবে, কিন্তু তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করবে না।] তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা জানো না; হতে পারে, এ কারণে তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে; কিন্তু তোমরা এই দোয়া করো যে, হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে চাও সেভাবে তাদের (তথা শত্রুদের) বিরুদ্ধে আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও আর তাদের যুদ্ধকে আমাদের থেকে দূর করে দাও। [তিনি (সা.) এই দোয়াও শিখিয়েছেন যে, যুদ্ধ আবশ্যক নয়; যদি যুদ্ধ এড়ানো যায় তবে এড়িয়ে যাও।] কিন্তু এরপরও যদি তাদের সাথে যুদ্ধ হয় আর তারা একত্র হয়ে হইচই করে তবে তোমার জন্য আবশ্যক হলো আত্মমর্যাদা ও নীরবতা বজায় রাখা। [অর্থাৎ নীরবতা ও আত্মমর্যাদার সাথে যুদ্ধ করবে।] আর তোমরা পরস্পর ঝগড়া করবে না, নতুবা তোমরা ভীতু হয়ে যাবে আর তোমাদের প্রভাব ও ত্রাস নিঃশেষ হয়ে যাবে। [নিজেদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করো।] আর তোমরা দোয়া করো, **হে আল্লাহ্! আমরা তোমার বান্দা আর তারাও তোমার বান্দা। আমাদের ও তাদের ভাগ্য তোমার হাতে আর তুমিই তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট হতে পারো।** আর তোমরা জেনে রাখ! তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত রয়েছে। হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর হাতে প্রস্তুত করা পতাকা নিয়ে রওয়ানা হন এবং সেটিকে হযরত বুরাইদা বিন হুসাইব (রা.)-কে প্রদান করেন আর জুরফ নামক স্থানে সৈন্যসমাবেশ করেন। জুরফ মদীনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান। আনসার ও মুহাজিরদের সকল সম্মানিত ব্যক্তিকে এই যুদ্ধে যোগদানের জন্য ডাকা হয়। তাদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত কাতাদা বিন নু'মান, হযরত সালামা বিন আসলাম প্রমুখ অর্ন্তভুক্ত ছিলেন; সকলকে হযরত উসামা (রা.)-র অধীনস্থ করা হয়েছিল। কতক লোক কথা বলা শুরু করে দেয় আর তারা বলে, এই

ছেলেকে প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের ওপর আমীর নিযুক্ত করা হচ্ছে! [এখানে বড়ো বড়ো মুহাজির সাহাবী রয়েছেন, তা সত্ত্বেও এই ছেলেটিকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে!] মহানবী (সা.) যখন এসব কথা জানতে পারেন তখন ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তিনি (সা.) মাথায় একটি রুমাল বেঁধে রেখেছিলেন এবং গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) মিম্বরে আরোহণ করেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর বলেন, হে লোকসকল! উসামাকে আমীর বানানোর কারণে তোমাদের অনেকের কানাঘুষার কথা আমি জানতে পেরেছি। আমি উসামাকে আমীর বানানোর কারণেই যে কেবল তোমরা এখন আপত্তি করছ– তা নয়; বরং তার পূর্বে তার পিতাকে আমীর নিযুক্ত করার কারণেও তোমরা আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহ্র কসম! সে-ও (রা.) আমীর হিসেবে যোগ্য ছিল এবং তার পরে তার পুত্রও আমীর হবার যোগ্য। সে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা আমার সবচেয়ে প্রিয়জন, আর নিশ্চয় এরা উভয়ে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার সৎকাজ ও পুণ্যকর্মের ধারণা করা যেতে পারে। কাজেই উসামা (রা.) সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করো, কেননা সে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের একজন।

যে-সব মুসলমান হযরত উসামা (রা.)-র সাথে রওয়ানা হচ্ছিল তারা মহানবী (সা.)-কে বিদায় জানিয়ে জুরফ নামক স্থানে সেনাদলে যোগদান করার উদ্দেশ্যে চলে যেত। (ইতোমধ্যে) মহানবী (সা.)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়, তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, উসামার সেনাদলকে পাঠিয়ে দাও, তারা অবশ্যই যাবে। **রবিবার** দিন মহানবী (সা.)-এর কষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়। হযরত উসামা (রা.) সেনাদল থেকে ফেরত আসেন। সে মুহূর্তে তিনি (সা.) অচেতন অবস্থায় ছিলেন। [অসুস্থতা বেড়ে যাবার সংবাদ পেয়ে তিনি (রা.) ফিরে আসেন।] সেদিন লোকজন তাঁকে (সা.) ঔষধ সেবন করিয়েছিল। [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে ঔষধ খাইয়েছিল।] হযরত উসামা (রা.) মাথা ঝুঁকিয়ে মহানবী (সা.)-কে চুম্বন করেন। মহানবী (সা.) তখন কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু তাঁর দুহাত আকাশপানে তুলছিলেন আর হযরত উসামার মাথায় রাখছিলেন। হযরত উসামা (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি– তিনি (সা.) আমার জন্য দোয়া করছেন। হযরত উসামা (রা.) সেনাদলের মাঝে ফিরে যান। **সোমবার** হযরত উসামা (রা.) পুনরায় মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন, তখন তিনি (সা.) সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সহকারে যাত্রা করো। হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ সেনাদল অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অন্যদেরও যাত্রা করার নির্দেশ দেন। তিনি যাত্রা আরম্ভ করতে উদ্যত হতেই তার অর্থাৎ হযরত উসামার (রা.) মা হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-র পক্ষ থেকে জনৈক ব্যক্তি বার্তা নিয়ে আসে যে, মহানবী (সা.) জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অতিক্রম করছেন বলে মনে হচ্ছে। একথা শুনে হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হন, হযরত উমর ও হযরত আবু উবায়দাও তার সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন, যে কারণে মুসলমান সেনাদল জুরফ নামক স্থান থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে আর হযরত বুরাইদা বিন হুসাইব (রা.) হযরত উসামা (রা.)-র পতাকা নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর দরজার পাশে গেড়ে দেন।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত উসামা (রা.)-র সেনাদল যখন **যু-খুশুব** নামক স্থানে ছিল তখন মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন। **যু-খুশুবও** মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত। এটি একটি উপত্যকা। মোটকথা তারা ফিরে আসেন।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরে লোকেরা যখন হযরত আবু বকর (রা.)-র হাতে বয়আত সম্পন্ন করে তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বুরাইদা বিন হুসাইব (রা.)-কে আদেশ দেন, পতাকা নিয়ে তুমি হযরত উসামা (রা.)-র বাড়ি যাও যেন তিনি (রা.) স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে যাত্রা করেন। হযরত বুরাইদা (রা.) পতাকাটি সেনাদলের পূর্বোক্ত স্থানে নিয়ে আসেন। এই সেনাদলের সংখ্যা তিন হাজার বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যার মাঝে এক হাজার অশ্বারোহী ছিলেন। আর অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে সাতশ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরের দিন হযরত আবু বকর (রা.) ঘোষণা করিয়ে দেন, উসামার অভিযান পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হবেই। উসামার সেনাদলের কোনো একজন সদস্যও যেন মদীনায় না থাকে, বরং তারা সবাই যেন জুরফ-এ গিয়ে তার সেনাদলের সাথে যুক্ত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সমগ্র আরব মুরতাদ হয়ে যায় আর হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-র ন্যায় সাহসী ব্যক্তিও এই নৈরাজ্য দেখে ঘাবড়ে যান। মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রোমান এলাকায় আক্রমণের জন্য একটি সেনাদল প্রস্তুত করেছিলেন এবং হযরত উসামা (রা.)-কে এর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সেনাদল রওয়ানা হবার পূর্বেই মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুতে যখন সমগ্র আরব মুরতাদ হয়ে যায় তখন সাহাবীগণ মনে করেন, যদি এরূপ বিদ্রোহপূর্ণ অবস্থায় হযরত উসামা (রা.)-র সেনাদলকে রোমানদের এলাকায় আক্রমণের জন্য প্রেরণ করা হয় তাহলে মদীনায় কেবলমাত্র বৃদ্ধ পুরুষ, শিশু ও নারীরাই থেকে যাবে এবং মদীনার নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই থাকবে না। তাই তারা প্রস্তাব দেয় যে, বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের একটি প্রতিনিধিদল হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে যাবে এবং তাঁর নিকট নিবেদন করবে, তিনি (রা.) যেন নৈরাজ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সেনাদলের যাত্রা স্থগিত রাখেন।

অতএব হযরত উমর (রা.) ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সাহাবী তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁরা নিবেদন করেন, বিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন এই সেনাদলের যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এই কথা শোনেন তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সেই প্রতিনিধিদলকে এই উত্তর প্রদান করেন যে, তোমরা কি এটি চাও− মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু কুহাফার পুত্র [অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)] সর্বপ্রথম কাজ এটি করবে যে, যে সেনাদলকে মহানবী (সা.) যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন− সেটিকে যাত্রা করা থেকে বিরত রাখবে? এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! শত্রুপক্ষের সেনারা যদি মদীনায় প্রবেশও করে ফেলে এবং কুকুর মুসলমান নারীদের মৃতদেহ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়, তবুও আমি এই সেনাদল প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকব না যেটিকে মহানবী (সা.) প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সাহসিকতা ও বীরত্ব হযরত আবু বকর (রা.)-র মধ্যে এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল কারণ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ (সূরা আল-ফাতহ: ৩০)

যেভাবে বিদ্যুতের সাথে যদি সাধারণ তারও সংযুক্ত করা হয় তাহলে এর মধ্যে মহাশক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়, তদ্রূপ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহচর্যের ফলে তাঁর অনুসরণকারীরাও أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ-এর সত্যায়নস্থলে পরিণত হয়েছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উসামা (রা.)-র নেতৃত্বাধীন সেনাদলের যাত্রা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'সির্‌রুল খিলাফাহ্'-তে বর্ণনা করেন, ইবনে আসীর তার ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন, মহানবী যখন (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মক্কায় ও সেখানকার গভর্নর আত্তাব বিন আসীদের কাছে পৌঁছায়, তখন আত্তাব লুকিয়ে পড়েন এবং মক্কা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে আর সেখানকার অধিবাসীরা মুরতাদ হবার উপক্রম হয়। তিনি আরো লেখেন, আরবের অধিবাসীরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক গোত্রের সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিরাও মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, কপটতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দেওয়া শুরু করে, [অর্থাৎ এটি দেখছিল যে, এখন মুসলমানার দুর্বল হয়ে গেছে, তাই আমরা এখন আক্রমণ করতে পারি।] আর মুসলমানদের অবস্থা তাদের নবীর মৃত্যুর কারণে, উপরন্তু নিজেদের সংখ্যালঘুতা ও শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এমন হয়ে গিয়েছিল যেরূপ বর্ষণমুখর রাতে ভেড়া-ছাগলের হয়ে থাকে। [অর্থাৎ অতিরিক্ত ভিজে যাবার দরুন স্বাভাবিক নড়াচড়া করার শক্তি থাকে না।] এতে লোকজন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, লোকজন কেবল উসামার সেনাদলকেই মুসলমানদের সেনাদল জ্ঞান করে থাকে। আর যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আরবরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই মুসলমানদের এই দলটিকে আপনার থেকে পৃথক করা (এই মুহূর্তে) সমীচীন হবে না। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি নিশ্চিতও হই যে, বন্য পশুর দল আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, তবুও আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে উসামার বাহিনীকে অবশ্যই পাঠাবো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা আমি বাতিল করতে পারি না। মোটকথা, তিনি মহানবী (সা.)-এর আদেশকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ও কার্যকর করেন এবং যে-সকল সাহাবী হযরত উসামার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদেরকে আবার বাহিনীতে যোগ দেবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে পূর্বে উসামার বাহিনীতে ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) যাকে এতে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে যেন কখনো পিছিয়ে না থাকে এবং আমি তাকে পিছিয়ে থাকার অনুমতি দেবো না; এমনকি তাকে পায়ে হেঁটে যেতে হলেও সে অবশ্যই সাথে যাবে। ফলে কেউই আর পিছিয়ে রইলেন না, অর্থাৎ সবাই রওয়ানা হলেন।

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.)-র এই বাহিনী প্রেরণের বিষয়ে লেখা হয়েছে, যখন হযরত আবু বকরের নির্দেশ অনুসারে উসামার সেনাদল জুরফ নামক স্থানে একত্রিত হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজে সেখানে যান এবং গিয়ে বাহিনী পরিদর্শন করেন ও সেনাদলকে সুবিন্যস্ত করেন। এ প্রসঙ্গে এটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-কে বলেন, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে হযরত উমর (রা.)-কে আমার কাজকর্মে সহায়তার জন্য রেখে দিন। কারণ হযরত উমর (রা.)-ও তখন ঐ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উসামা (রা.) অনুমতি দেন। এই ঘটনার পর যখনই হযরত উমরের (রা.) সাথে হযরত উসামার (রা.) সাক্ষাৎ হতো, এমনকি খলীফা নির্বাচিত হবার পরেও তাকে সম্বোধন করে বলতেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহাল আমীর, অর্থাৎ হে আমীর! আসসালামু আলাইকুম। আর এর জবাবে হযরত উসামা (রা.)-ও বলতেন, গাফারাল্লাহু লাকুম (অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন)।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-কে তাঁর নিজস্ব নির্দেশনার পাশাপাশি এ-ও বলেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন– তুমি সবকিছু করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশ পালনে কোনো প্রকার অলসতা দেখাবে না।

যুদ্ধের বিবরণ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, আমি তা বাদ দিচ্ছি। মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছিলেন, এই বাহিনী সফল হয়ে ফিরে আসে। শত্রুরা হয় নিহত হয়েছে নতুবা বন্দি হয়েছে। এই যুদ্ধে কোনো মুসলমানেরই কোনো প্রাণহানি হয় নি। বর্ণনা অনুযায়ী এই বাহিনী চল্লিশ থেকে সত্তর দিন বাইরে থাকার পর মদীনায় ফিরে এসেছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-র এতটাই ভালোবাসা ছিল যে, উসামার সেই পতাকাটি– যেটিতে মহানবী (সা.) নিজের হাতে গিঁট দিয়েছিলেন; যেটি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, এটা কীভাবে সম্ভব যে, আবু কুহাফার পুত্র সেই পতাকার গিঁট খুলে দেবে যা মহানবী (সা.) নিজের হাতে লাগিয়েছেন? বস্তুত উসামার বাহিনী ফিরে আসার পরেও সেই পতাকার গিঁট খোলা হয় নি এবং সেই পতাকা পরে হযরত উসামা (রা.)-র বাড়িতেই ছিল, যতদিন না হযরত উসামা (রা.)-র মৃত্যু হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ।

যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা এখানেই সমাপ্তি হলো। ভবিষ্যতে জীবনী সংক্রান্ত আরো কিছু দিক পর্যালোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ্; আমি দেখব।

এখন আমি দুইজন প্রয়াত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে চাই এবং পরে ইনশাআল্লাহ্ জানাযা পড়াবো। শ্রদ্ধেয় আযীযুর রহমান খালিদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে আমেরিকায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের নানা হযরত মিয়াঁ রাঙ্গ আলী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। আযীযুর রহমান খালিদ সাহেবের জামেয়াতে ভর্তি হবার ঘটনাটি হলো– তিনি বলেন, আমি যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়তাম তখন একদিন তালীমুল ইসলাম হাইস্কুলের অ্যাসেম্বলিতে হযরত মওলানা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব আসেন এবং জীবন উৎসর্গের আবশ্যকতা ও গুরুত্বের ওপর বক্তৃতা করেন। এর ফলে অনেক ছাত্রের ওপর এই বক্তৃতার খুব প্রভাব পড়ে। বক্তৃতা শেষ হলে মরহুমের ভেতর জীবন উৎসর্গ করার স্পৃহা জেগে ওঠে; তিনি সোজা জামেয়াতে চলে যান। সেখানে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর ১৯৬০ সালে জামেয়াতে তার ভর্তির সুযোগ লাভ হয় এবং ১৯৬৯ সালে জামেয়া থেকে তিনি শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। জামেয়াতে নয় বছর লাগার কারণ হলো, এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হন, এর ফলে দুই বছর অপচয় হয়। কিন্তু যা-ই হোক, তিনি সাহস হারান নি আর তার জীবনও রক্ষা পায়। তিনি একথা বলতেন, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র দোয়ার কল্যাণে আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। মুবাল্লিগ হবার পর তিনি বাইরের বিভিন্ন দেশ যেমন সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, ঘানা, তানজানিয়া, জাঞ্জিবার প্রভৃতি দেশে ছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। (বিদেশ থেকে) ফিরে আসার পর তিনি রাবওয়ায় তাহরীকে জাদীদের ওয়াকালত ইশায়াতে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার দৌহিত্র মুরব্বী হামযা উবায়দুল্লাহ্, জামেয়া থেকে পাশ করেছেন; তিনি বলেন, আযীযুর রহমান সাহেব বলতেন, আফ্রিকাতে এমন সময়ও আসত যে, ভাতের ওপর লবণ ছিটিয়ে খেতাম, এছাড়া কোনো তরকারি বা অন্য কোনো খাবার জিনিস থাকত না। আর কখনো কখনো এমন দিনও আসত যখন সামান্য খাবারও পাওয়া যেত না, ভাতও থাকত না। মাঝে মাঝে কয়েক দিন উপোসও থাকতে হতো। অতএব এটি ছিল প্রথমিক যুগের মুরব্বী-মুবাল্লিগদের অবদান যা বর্তমান যুগের মুরব্বী-মুবাল্লিগদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তার পুত্র আনিসুর রহমান আনাস বলেন, কখনো খাবার অপচয় হতে দিতেন না। জলসার সময়েও বহুবার এমন হয়েছে যে, প্লেটে খাবার নেবার পরিবর্তে টেবিলের ওপর অবশিষ্ট রুটির যে

টুকরোগুলো থাকত সেগুলোই খেতেন। আর বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি এই রুটির টুকরো খেতে পারেন তবে আমরা কেন খেতে পারব না? যৌবনকাল থেকেই তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। সদাচারী, বন্ধুভাবাপন্ন, সহানুভূতিশীল, পুণ্যবান, পরিশ্রমী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। মরহুম মূসীও ছিলেন। আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন তিনিও আমার সাথে ছিলেন। পরম বিশ্বস্ততার সাথে, ভীষণ পরিশ্রমের সাথে এবং নিতান্তই অকৃত্রিমভাবে তিনি কাজ করেছেন, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন। তার দুইজন পুত্র ও তিনজন কন্যা এবং অনেক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী আছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয় ইদী হুমাইদী সাহেবের; তিনি ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ২২ নভেম্বর তিনি উমরা করার সৌভাগ্য লাভের পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে এই অসুস্থতায় ৭৭ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পরিবারে ১৯৩০-এর দশকে আহমদীয়াত আগমন করে যখন তার মামা মোহাম্মদ রউফ সাহেব হযরত মওলানা রহমত আলী সাহেব (রা.)-র মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর তারা নানা এবং মা-ও বয়আত গ্রহণ করেন। তার জামাতা বাসূকী আহমদ সাহেব একজন মুরব্বী সিলসিলা। তিনি বলেন, দিবানিশি তার তবলীগ করার আগ্রহ ছিল। আর এই বাসনাই রাখতেন, তবলীগের পথেই জীবন বিলিয়ে দেবো। তিনি আরো বলেন, যখনই আমাদের সাক্ষাৎ হতো তখন সর্বদা তবলীগই আলোচ্য বিষয় হতো। তার তবলীগের ধরনও অনেক মুবাল্লিগের জন্য অনুকরণীয় হতো। তার কন্যারাও লিখেছেন, আযানের পূর্বে মসজিদে চলে যেতেন এবং যিকরে এলাহীতে রত থেকে সময় অতিবাহিত করতেন। প্রত্যহ কুরআন তিলাওয়াত করতেন, অনুবাদ ও তফসীর পাঠ করতেন, তবলীগের জন্য প্রয়োজনীয় আয়াত চিহ্নিত করতেন। কখনো তাহাজ্জুদের নামায বাদ দেন নি। ৭৬ বছর বয়সেও তবলীগের জন্য মোটরসাইকেলে সফর করতেন। সন্তানদের বলতেন, সম্পদ কুরবানী করতে কার্পণ্য করবে না, এটি আল্লাহ্র প্রাপ্য অধিকার। সাধ্যানুযায়ী যত বেশি পারো আর্থিক কুরবানী করো। আর সাবধান! জামা'তের সম্পদ থেকে একটি কানাকড়িও ব্যবহার করবে না; এর হিসাব দিতে হবে। উমরার সময় তার দলের যিনি দলনেতা ছিলেন, তিনি লেখেন, উমরা চলাকালীন পুরোটা সময় মরহুম বলতেন, এখান থেকে ফেরত গিয়ে আমি তবলীগ করব আর মানুষজনকে বলব, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা মক্কায় হজ্জব্রত পালন করেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে একজন ডাক্তার তার চিকিৎসা করেছিলেন আর তার মৃত্যুর পর সেই ডাক্তার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার পুণ্যকর্মসমূহকে পছন্দ করেছেন বিধায় জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হবার সৌভাগ্য পেয়েছেন। অর্থাৎ তার সেখানেই মৃত্যু হয় এবং সেখানেই জান্নাতুল বাকীতে তার দাফন হয়েছে। আর পাকিস্তানে আমাদের আহমদীদেরকে নিজস্ব কবরস্থানেও দাফন করতে বাধা দেওয়া হয়; আর নিকটে অন্য কোনো মুসলমানের কবর থাকলে তারা বলে, এই (আহমদীর) কবরের ধারেকাছে ভিড়বে না! অপরদিকে দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এখন পারলে তারা (তথা বিরুদ্ধবাদীরা) সেখান থেকে তার কবর উপড়ে ফেলুক! কিন্তু তাদের এত ক্ষমতা কোথায়? ইনশাআল্লাহ্, এই মৌলবীরা নিজেরাই নিজেদের চূড়ান্ত মন্দ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়া জামা'তের সেক্রেটারি তবলীগ বানাওয়ান ওয়ারদী সাহেব বলেন, একজন সফল ও অত্যন্ত উদ্যমী দাঈ ছিলেন, যিনি **'একটি দিনও তবলীগ ছাড়া অতিবাহিত হবে না'–** এই শ্লোগানকে প্রকৃত অর্থেই নিজের জীবনের অংশে পরিণত করেছিলেন। তার একটি পুরোনো মোটরসাইকেল ছিল, সেটিতে চড়ে তিনি দূরদূরান্তের গ্রামগঞ্জে সফর করতেন আর যে-সব এলাকায় জামা'তের বিরোধিতা ছিল সেখানেও যেতেন। শত শত মানুষকে তবলীগ করার মাধ্যমে তাদের মাঝ থেকে বেশ কয়েকজনকে তিনি বয়আতও করিয়েছেন। তিনি বলেন, খিলাফতের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল, গভীর ভালোবাসা ও হৃদ্যতা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি চার কন্যা ও দশজন নাতিনাতনি রেখে গিয়েছেন। আমি পূর্বেই বলেছি, তার একজন জামাতা আছেন যিনি মুরব্বী। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)